ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

প্রসূন মাঝি

বাংলা গানে আধুনিকতার নানারকম প্রবর্তনা যাঁদের গানে প্রথম ফুটে উঠেছিল তাঁদের অগ্রচারী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১)। সেই অগ্রচারিতার কারণ তাঁর জন্মগত অগ্রজ অবস্থান এবং দীর্ঘজীবিতায়, রচনার ব্যাপ্তিতে, বৈচিত্র্যে গ্রহণীয়তায়। সংগীত জীবনের বহু শাখায়িত প্রসারণ, গানের সংখ্যাগত বিস্তার আর প্রচার গৌরবেও রবিকররেখা বড়োই পরাক্রান্ত ও বহুবিস্তারী। বাংলা সংগীতের প্রান্তরকে যদি এক শ্যামল বনভূমি বলে ভাবি আমরা তবে রবীন্দ্রসংগীতকে মনে হবে যেন বনস্পতির মতো সমুচ্চ ও মহিমাময়। কিন্তু তার আশেপাশে কয়েকটি একক বৃক্ষের মহিমাও কিছু কম নয়। প্রথমেই মনে আসে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা (১৮৬৩) গানের সম্ভারকে।

বাংলা গানের আধুনিকতায় প্রধান দ্বিজেন্দ্রীয় ফসল হল তাঁর পরিকল্পিত চমকপ্রদ হাসির গান। তার সাংগীতিক নতুনত্ব আর গায়নের চমৎকারিত্ব ভেদ করে উঠে আসত পরাধীন, অনুকরণসর্বস্ব ও ইংরেজের চাটুকার এক শ্রেণির বাঙালির প্রতি তীব্র বিদ্রূপের শ্লেষাঘাত, যার পেছনে ছিল তাঁর গভীর স্বাদেশিকতার বোধ। কাপট্য আর শঠতা ঘেরা আমাদের বঙ্গসমাজের সেই সময়কার চালচলন, তার অনপনেয় গোঁড়ামি আর সংস্কার অন্ধতা দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানের শব্দ দিয়ে এক প্রতিবাদী বয়ান তৈরি করেছিলেন। আসর জমানো তাঁর নিজস্ব ঢঙে গাওয়া হাসির গান শেষ পর্যন্ত অবশ্য সচেতন শ্রোতাদের ভরিয়ে দিত শোচনায়। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ভাবুক, হাসির গান সামনাসামনি তার রচয়িতার কণ্ঠে শুনে বলেন 'এ তো হাসির গান নয় দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যে কান্নার গান।' স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলে ওঠেন, 'এ কি হাসির গান ? এ যে 'CRUELLEST TRAGEDY' অথচ আশ্চর্য যে এমন যে অপরূপ ও অপূর্বকল্পিত সংগীতের সম্পদ, তার সুর ও গায়ন রক্ষিত হয়নি, প্রচারিত হয়নি পরের প্রজন্মের গায়কদের কণ্ঠে

কণ্ঠে, স্বরলিপি করা হয়নি, রেকর্ডেড হয়নি। দুঃখের বিষয় যে, তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে আকস্মিক স্ত্রীবিয়োগের মর্মান্তিক আঘাতের জেরে দ্বিজেন্দ্রলাল আর কখনো হাসির গান লেখেননি। বরং বলেছিলেন গভীর খেদে,

> হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়?
> হাস্য করে অর্ধ জীবন করেছি তো অপচয়।

এমনতর ভাষ্যে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাদের লঘুচিত্ত আমোদগেরে সমাজ সমগ্র দ্বিজেন্দ্রগীতি সম্ভারের তেমন সমাদর করেনি সমকালে, কেবল বুঁদ হয়ে থাকত হাসির গানের মজায়। তার ফলে কোনো সভাসমিতি বা সমাবেশে দ্বিজেন্দ্রলাল উপস্থিত হলেই চেঁচিয়ে বলত, হাসির গান, দ্বিজুবাবু একটা হাসির গান হোক।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম গীতসংকলন 'আর্যগাথা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় বিলেত যাত্রার আগে ১৮৫২ সালের ৫ মার্চ। তাঁর ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যে লেখা ১০৮ টি গানের সংকলন এটি, কেন্দ্রীয় বিষয়- ঈশ্বরভক্তি ও স্বদেশ স্তুতি। কাব্য ও সংগীতের অপূর্ব মেলবন্ধন। 'আর্যগাথা' দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তাঁর বিবাহের পর। কেন্দ্রীয় বিষয় প্রেমচেতনা। 'কী দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি', 'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালোবাসি', 'যদি এসেছ বধূ হে', 'তোমারেই ভালোবেসেছি আমি', 'আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে' ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় প্রেমসংগীত। 'হাসির গান' সম্পূর্ণই সংগীত সংকলন। তাঁর অন্যান্য কাব্যেও রয়েছে গান। অনেকগুলি অপ্রকাশিত ও 'নাটকাদিতে প্রকাশিত গানগুলি' কবিপুত্র দিলিপকুমার রায় প্রকাশ করেছেন স্বতন্ত্র পুস্তককারে 'গান' নামে। এ এক বিরাট পথ পরিক্রমা, যার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কবিপুত্রের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য,

> প্রথম কথা এই যে, গানে তিনি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে ঝুঁকছিলেন। প্রথম জীবনে নিসর্গ চিত্রে, তারপর প্রণয়োচ্ছ্বাসে, তারপর স্বদেশ সংগীতে, তারপর প্রেমের তর্পণে সবশেষে ভক্তির অর্ঘ নিবেদনে। প্রণয় তাঁর প্রেমে পরিণত হয় তাঁর স্ত্রী বিয়োগের পর থেকেই, যখন চাইলেন তার প্রেম কে ঊর্ধ্বমুখী করতে, ব্যাপ্তি দিতে— যে আঁধারে তাঁর প্রেম নিবেদিত হত সেই মানুষটির অবর্তমানে প্রেম তাঁর খুঁজতে লাগল এক নব বিগ্রহ। দেশই হয়ে উঠলো সে বিগ্রহ - প্রথম দিকে। জীবনের মত কাব্যের বা গানেরও ক্রমপরিণতি বাইরে থেকে গভীরের দিকে, নিচের থেকে ঊর্ধ্বের দিকে। [দিলীপকুমার রায়, উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল]

তাঁর এই পরিক্রমা ও ক্রমবিকাশের কথা স্মরণ রেখেই দ্বিজেন্দ্রগীতির মূল নির্ধারণে অগ্রসর হওয়া যায়, খুঁজে নেওয়া যায় বাংলা সংগীতে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান।

সংগীতের ক্ষেত্রে মুক্তপন্থী দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সংগীতকেও মুক্তির মন্ত্রে

দীক্ষিত করেছিলেন। দেশি ও বিদেশি সংগীতের স্বভাব-পার্থক্য বিষয়ে সচেতন দ্বিজেন্দ্রলাল অনায়াসেই বাংলা গানে নিপুণ প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন ইউরোপীয় সুরের রূপ ও রীতিকে। গান ভেদে তার প্রয়োগ নানা ধরণের। যেমন- 'নুরজাহান' নাটকের 'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' গানের অন্তরায় রয়েছে বিলেতি সুরের আরোহণ-অবরোহণের অনবদ্য লীলাচাপল্য। 'ধন ধান্য পুষ্প ভরা' গানের কোরাসে 'সে যে আমার জন্মভূমি' অংশটি তিনবার তিন স্বরে গাওয়ার কায়দাটা বিদেশি ধাঁচের। 'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে' গানটির শেষাংশে সুরের যে ক্রমিক নাটকীয় আরোহণ আছে তা খাঁটি বিদেশি এফেক্ট, অথচ সহজে ধরা যায় না। কোরাস গানের আমদানি বাংলাগানে দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম মৌলিক প্রয়োগ। ভূপালি রাগে বাঁধা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' এই মার্চিং সুর আর তীব্র তালের ছন্দ একান্তই দ্বিজেন্দ্রলালের উপহার। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অন্ধ ভিক্ষুকের কণ্ঠে 'ঘন তমসাবৃত অম্বরধরণী' গানটি আগাগোড়া বিলেতি গানের সুরবিন্যাসে বাঁধা আছে স্তরে স্তরে। স্বরলিপিটি দেখলে বোঝাযেত বিলেতি সুরের সঙ্গে ভারতীয় সংগীতের কি আশ্চর্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রতিভা বাংলা গানে আজ পর্যন্ত একক ও অনুসরণহীন।

যদিও তাঁর এই রাগ মিশ্রণের প্রবণতার জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন যথেষ্ট। মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকার সাহিত্য সম্মেলনে টাউন হলের অধিবেশনে বলেছিলেন-

> ... আমার বর্তমান দুঃখ— নব্যযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সুরের সঙ্গীতচর্চা দেখিয়া। ... যেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের কতৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে। যখন পাঁচজন যুবক একসঙ্গে বসিয়া ওই খাড়া সুরে গান করিতে থাকেন, তখন আমার প্রাণে ব্যথা লাগে। ... দ্বিজেন্দ্রলাল কতৃক সুরের বিকৃত সাধনের কথা আমি বৈঠকী - সভায় চট্টগ্রামে তুলিয়াছিলাম, কাহারও মনে ছাপ লাগাইতে পারি নাই এবারে একেবারে সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম।
>
> [নবকৃষ্ণ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল, তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে]

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় প্রমথ চৌধুরী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতে,

> কাউকে সা রি গ ম (খাড়া সুর) সাধতে শুনলে সরকার মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, অথচ ধৈর্য্য ধরে সা রি গ ম অভ্যেস না করলে কি করে ও বিদ্যা যে আয়ত্ত করা যায় সে কথা তিনি বলে দেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে হিন্দু সংগীতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাঁর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অধিকার ছিল তাহা সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।
>
> [সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২]

তাঁর এই প্রতিভা কেবল নিন্দিত হয়নি, হয়েছে নন্দিতও। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন,

> দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ইংরেজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে

হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতে বিদেশি সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয় তাঁকে আশীর্বাদ করবেন।

যদিও বাংলা গানে বিদেশি সুরের প্রয়োগের সূত্রপাত ঠাকুর পরিবারের হাত ধরেই, সৌজন্যে সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর। এ সময় থেকেই বিলেতি সংগীত ও বাদ্যচর্চায় জোয়ার আসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের দুটি গানে বিলেতি সুর লেগেছে। বিলেত ফেরৎ রবীন্দ্রনাথও বিলেতি সুরের চর্চা করেছেন— 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'য়। সুরের আইরিশ মেলোডিজ থেকে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত দ্বিজেন্দ্রলালের মতো বিলেতি সুরের সার্থক প্রয়োগ বাংলা গানে অলক্ষিত।

সমগ্র সংগীত জীবনে নানা পর্যায়ে নানা ভাবে তিনি বিদেশি গানের ধরন ব্যবহার করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। এই প্রয়োগ কখনো স্বদেশি গানে ওজস সৃষ্টির গভীরতায়, কখনো রণসংগীতের উদ্দাম আহ্বান মন্ত্রে, কখনো বা কোরাস গানের বৈচিত্র্যে। তার জন্য সর্বদা যে স্বরবর্ণের ওপর নির্ভর করেছেন তেমন নয়, যুক্তাক্ষরের নির্দিষ্ট বিন্যাসেও বিলেতি সুরের চলনকে ব্যবহার করেছেন সুন্দর ভাবে। যেমন,'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' গানটিতে স্নিগ্ধ কান্ত শান্তি সুপ্তি ভরা চরণে যুক্তাক্ষরের সুষম সন্নিবেশে সুর এসেছে। ধ্বনির গাঢ়তা, সমাসবদ্ধ পদের গাম্ভীর্য ও সুরের সকম্প চলন শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশের কানেও আবেদন তুলেছিল। দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপকুমার রায় তাঁর 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এক্ষেত্রে প্রধান তাঁর নাট্যগানগুলি। গান নাটকের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এনে দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন গানের আর এক মুখশ্রী।

দ্বিজেন্দ্রলালের গান স্বচ্ছ-সহজ-লীলায়িত। কেবল বিদেশি সুরের মিশ্রণ সৃষ্টিতে নয়, দেশীয় প্রচলিত সুরের ক্ষেত্রেও দ্বিজেন্দ্রলাল রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বাক্ষর। দেশীয় সুর সৃষ্টি-পদ্ধতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সাধন করেছেন মৌলিক পরিবর্তন। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রেম সংগীতের ধারায় প্রাক-দ্বিজেন্দ্র যুগে টপ্পার যে একাধিপত্য ছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তার মোড় ঘুরিয়েছেন। টপ্পার পাশাপাশি তিনি খেয়াল এবং টপ-খেয়ালের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য বাংলা প্রেম সংগীতে সংযুক্ত করেছেন। তাঁর গানে কীর্তন এবং লোকসংগীতের নানা মাত্রিক প্রভাবও লক্ষণীয়। যেমন,

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে, ফিরিতে চাহে না আঁখি
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই অবাক হইয়ে থাকি।

আর্য্যগাথায় রক্ষিত কবির এই স্বপ্নময় প্রেমের অস্ফুট কাকলীতে ধ্বনিত হয়েছে কীর্তনের সুর। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলাল কবি হিসেবে গান বেঁধেছেন আর সুরকার হিসাবে কীর্তন-বাউল-খেয়াল-টপ্পা-ধ্রুপদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। রাগ সংগীতের আশ্রয়ে প্রতীচ্য সংগীতের উত্থান- পতন এবং স্বরগ্রামের বৈচিত্র্য ও স্বরবিরাম মিশিয়েছেন বাংলার নিজস্ব সুরধারার সঙ্গে, সৃষ্টি করেছেন নতুন সুর।

পতিতোদ্ধারিনি গঙ্গে - ভৈরবী ঠাট
এ জনমে পুরিল না সাধ ভালবাসি - ভৈরবী
ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী -- ভূপালী ঠাট
প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা- কীর্তন

কেবল গানের সুর-সৃষ্টিতে নয়, গানের ভাব-সম্পদের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের অবদান অনস্বীকার্য।

নির্মম সমাজসত্যকে কবিতা ও গানের যুগলবন্দিতে নির্মল কৌতুকের আবরণে পরিবেশন বড়ই উপভোগ্য। যদিও স্বদেশপ্রেম নিয়ে অনেক ভাবগম্ভীর গানও রচনা করেছেন তিনি- 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'আছি গো তোমার চরণে জননী', প্রভৃতি গানে দেশমাতৃকার যে অখন্ড শাশ্বত রূপ এঁকেছেন তা অনবদ্য। তবে কোথাও কোথাও হাসির গানের শিল্প উপকরণ স্থুল। কিন্তু জীবনার্থের প্রভাবে এই শিল্প উপাদানগুলি কালোত্তীর্ণ সৃষ্টির মর্যাদায় অভিষিক্ত—তাঁর প্রাতিস্বিক প্রতিভার স্বাক্ষর

গ্রন্থঋণ :
১. দ্বিজেন্দ্র রচনা সংগ্রহ : গোপাল হালদার ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত
২. দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার : রথীন্দ্রনাথ রায়
৩. দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী
৪. স্মৃতিচারণ : দিলীপকুমার রায়
৫. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবন ও সাহিত্য : দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়
৬. উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল : দিলীপকুমার রায়
৭. সাঙ্গীতিক : দিলীপকুমার রায়
৮. দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণ বিস্মরণ : সুধীর চক্রবর্তী